সংবাদ

তারিখ ... 21 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ১ ...

প্রতিক্রিয়া

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা কি লেখাপড়া করতে পারবে?'

শরদিন্দু ভট্টাচার্য্য টুটুল

মাঝে মধ্যে হঠাৎ করেই বিষাদে মনটা আচ্ছন্ন হয়ে যায়, কিছু ভাল লাগে না, কোন কাজ-কর্মে মন বসে না। একটা ভয়াবহ মন খারাপের দৈত্য যেন আমাদের সবকিছুকে তছনছ করে দেয়। স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে যদি কোন কিছু না চলে কিংবা মনের মধ্যে যদি প্রতিনিয়ত রক্তক্ষরণ হয় তাহলে তো দুর্বিষহ আমাদের ঘরে, মনে দুর্দান্ত প্রতাপ নিয়ে বাঁশি বাজাবেই। সে বাঁশির সুর কে ঠেকাতে পারবে? জীবন গতিশীল, প্রবহমান। জীবনের গতির ধারায় ছেদ পড়লেই স্বপ্ন থেমে যায়, স্বপ্ন থেমে গেলে আরোপিত দুঃখ এসে মানুষকে নৈতিক মূল্যবোধ থেকে উৎখাত করে। নৈতিক মূল্যবোধ থেকে মানুষ উৎখাত হলে জীবনের প্রাণস্পন্দন থেমে যায়। সৃজনশীল মানুষের স্বপ্নময় ইচ্ছা পঙ্গু হয়ে গেলে অনাচার দেখা দেয়, অবিচার গ্রাস করে লোকালয়ের নিবিড় উচ্ছ্বাস থেকে সৃষ্ট ন্যায়-অন্যায় বোধের গভীরে/সে লোকালয়ের জনগোষ্ঠী ন্যায়-অন্যায় বোধের ধার ধারে না সেখানে সুন্দরের সৃজন হয় না। দুষ্টের দমন কঠিন হয়ে পড়ে। দুষ্টের দমন না হলে মানুষ বাঁচবে কি করে।

আমরা একটা সময় পার করে এসেছি, যেখানে রাজনীতির নামে দুর্বৃত্তায়নের নগ্ন নৃত্য চলছিল। যে যত বেশি উলঙ্গ হতে পারত তারই অধিক মূল্যায়ন করতেন আমাদের অতি ভাগ্যবান, ক্ষমতাবানরা। নষ্টরা ধরাকে সরা ভেবে নিজেদের কুকর্মগুলো অতিযত্ন সহকারে করে যেত। যারা প্রতিবাদ করত তাদের বিভিন্নভাবে হয়রানি করা হতো। মিথ্যা অপবাদে কষ্ট দেয়া হতো। সবাই যেন একটা মগের মুল্লুকের মধ্যে বাস করত। কিংবা বাস করতে বাধ্য করা হতো। একদিকে চলত ক্ষমতাবানদের আস্ফালন আর অন্যদিকে সন্ত্রাসীরা বীভৎস পন্থায় গরু-ছাগলের মতো নিরীহ মানুষকে হত্যা। শত ভাবনার মাঝে ঠাঁই নিত মানুষের ভয়ার্ত জীবনের ছবি। অথচ আমাদের কর্তাব্যক্তিরা তাতে বিচলিত হতেন না। তাদের ভাবনায় শুধু খেলা করত ক্ষমতা আর নিজস্ব সুখ ভাবনার কথা। এর বাইরেও যে জগত-সংসারে অনেক বিষয় আছে কিংবা দেশ যে রসাতলে যাচ্ছে তা তারা তখন স্বীকার করতে চাননি। একটা বিষয় ক্ষমতাবানরা তখন চিন্তা করে দেখেননি। আর তা হলো মানুষের মঙ্গল সাধনায় নিয়োজিত না হলে একদিন অবশ্যই পস্তাতে হয়। এমন সময়ও আমরা পার করে এসেছি যখন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, চাঁদাবাজি, ভূমিদস্যুতা, ধর্ষণ ইত্যাদি কতিপয় ক্ষমতাবানদের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল। সবাই কোন উপায় না দেখে মনে মনে নিজস্ব পন্থায় বুঝে নিয়েছিল ক্ষমতাবানরা যা করবে, তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করা যাবে না। যিনি প্রতিবাদ করবেন তাকে ভয়াবহ বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হবে। অন্যদিকে আমাদের এক শ্রেণীর নেতা নিজস্ব হীনস্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য যেভাবে সন্ত্রাসীদের লালন-পালন করতেন তা দেখে মনে হতো রাজনীতি বিষয়টা আদর্শচ্যুত নেতাদের আয়-উন্নতির উচ্চ শিখরে ওঠার সিঁড়ি। মানুষ যেমনভাবে বাড়িতে কুকুর, বিড়াল পুষত ঠিক তেমনি করে আমাদের অনেক নেতা সন্ত্রাসী ক্যাডারবাহিনী পুষতেন। এসব সন্ত্রাসী ক্যাডাররা কতিপয় নেতার হয়ে ভূমি দখল থেকে শুরু করে যত রকম অপকর্ম আছে সব করে যেত। কেউ কেউ আবার তাদের সোনার ছেলেও বলতেন। এখানে কোন রাজনৈতিক দলের সমালোচনা করা হচ্ছে না। তাদের অপকর্মের কথাই বলা হচ্ছে, যারা ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করতে গিয়ে দলকে ব্যবহার করে তার রাজনৈতিক পার্টিকে সাধারণ মানুষের কাছে দস্যুবাহিনীতে পরিণত করেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কি হচ্ছে। যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এদেশের প্রগতিশীল আন্দোলনের সূতিকাগার হিসেবে পরিচিত ছিল সেখানেই নাকি এখন সংখ্যালঘু ছাত্ররা ক্লাস করতে বিব্রতবোধ করে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। সেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংখ্যালঘু ও প্রগতিশীল ছাত্রছাত্রীরা লেখাপড়া করতে পারবে কি না সবার মনে সন্দেহের কালো মেঘ আজ উঁকি মারছে। গত ২০ চৈত্র ১৪১৪ বাংলা দৈনিক জনকণ্ঠে প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থীদের কোর্স বহির্ভূতভাবে জোরপূর্বক শিক্ষা দেয়া হচ্ছে হিন্দু দেবদেবীদের জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করে। এমনকি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহীদের নিয়েও কটাক্ষ করা হচ্ছে। যার জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যেও চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে। শিক্ষার্থীরা জানায়, তারা ভয়ে কিছু বলতে বা করতে পারছে না। ক্লাসে শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এমন উপদেশ দিয়ে থাকেন হিন্দু ছাত্ররা যেন তাদের নাম পরিবর্তন করে ফেলে। এখন প্রশ্ন হলো একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি সংখ্যালঘু ছাত্ররা এমনভাবে মানসিক সন্ত্রাসের শিকার হয়ে থাকে তাহলে কি করে তাদের মেধা ও মননশীলতা পরিশীলিত হয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হবে। সংখ্যালঘু একজন ছাত্রকে যদি বলা হয় তোমাদের দেবদেবী জন্তু-জানোয়ার কিংবা তোমরা তোমাদের নাম পরিবর্তন করে ফেল, তাহলে তো অধ্যয়নরত সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীরা মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে পড়বে। সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকরা যদি ধরে নেয়, তাদের ছেলেমেয়েদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে ফেলার জন্য ষড়যন্ত্র চলছে তাহলে তাদের কি দোষ দেয়া যাবে? এখন উচিত হলো প্রত্যেক প্রগতিশীল ব্যক্তিকে এসবের ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া। তা যদি হয়ে থাকে সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের মানসিকভাবে পঙ্গু করার এক ষড়যন্ত্র তাহলে সেই ষড়যন্ত্রের জাল ছিন্ন করার দায়িত্ব হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এবং সংশ্লিষ্ট বিবেকবান ব্যক্তির।

এখন মানুষ মনে করে সময়ের পরিবর্তন হয়েছে। চলমান অবস্থায় কোন অন্যায় কোথাও পৃষ্ঠপোষকতা পেতে পারে না। অন্যায়কারীরা কখনও চাইবে না মানুষ সুন্দরভাবে জীবনযাপন করুক। তবে এ কথাটি মনে রাখতে হবে যারা দুর্বৃত্ত তারা সব সময় তাদের দুর্বৃত্তপনা চালিয়ে যায়।

দেশের সংকটকালে এদেশের দরিদ্র মানুষরা সব সময় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এসেছে। অথচ দেশের সেসব মানুষই কখনও কিছু পায়নি। যারা দেশমাতৃকার জন্য সন্তান হারিয়েছে। সম্পদ হারিয়েছে সেসব না পাওয়া মানুষের দল আজ কিছু নির্লোভ চাওয়া চাইতেই পারে। তারা রাজামন্ত্রী হতে চায় না। তারা চায় রাতে শান্তিতে ঘুমাতে। জিনিসপত্রের দাম যেন তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে। ঘুষখোরদের দাপট যেন চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। অসুখ হলে সরকারি হাসপাতালে রোগীদের জন্য রক্ষিত ওষুধপত্র যেন হাসপাতালের বাইরে কালোবাজারে বিক্রি না হয়। আর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী চায়, তাদের ছেলেমেয়েরা যেন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিকভাবে লেখাপড়া করতে পারে। তাদের শ্রেণীশিক্ষক যেন তাদের ধর্মকে কটাক্ষ না করেন। তাদের মানসিকভাবে পঙ্গু করে দেয়ার জন্য তাদের দেবদেবীকে যেন জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে তুলনা করা না হয়। তাদের দিকে মুখ ফেরানোর সময় এসেছে। এই সুবর্ণ সময় নষ্ট করলে চলবে না। সাধারণ মানুষ যদি বোঝে তাদের জন্য কিছু করা হবে, তবেই তারা ভাল থাকার স্বপ্ন দেখবে। দেশবাসী বিশ্বাস রাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসাম্প্রদায়িকতা চেতনার যে সুনাম আছে, তা কেউ নষ্ট করতে পারবে না।

[লেখক : কবি ও গল্পকার, এডভোকেট]